‘মা আমায় ঘুরাবে কত’ - পদটি কোন পর্যায়ের পদ? রচয়িতা কে? পদটির কাব্যসৌন্দর্য বিচার করো।

‘মা আমায় ঘুরাবে কত’ পদটি রামপ্রসাদ সেন রচিত ‘ভক্তের আকুতি’ পর্যায়ের অন্তর্গত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। প্রকৃতির জাঁতাকলে সেই আবার সবচেয়ে অসহায় জীবে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘কর্তার ভূত’ রচনায় জানান— ‘‘দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্থ হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, ‘এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সব চেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা।’’ এই চলাকে সমর্থন করেননি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বদ্ধকুঠুরিতে আবদ্ধ মনে জগতের আলো দেখাতে চেয়েছিলেন। কারণ, সময়টা ছিলো আধুনিক যুগ। কিন্তু এর কয়েক শতাব্দী পূর্বে মধ্যযুগের ছায়াঘন জগতে শাক্ত কবি রামপ্রসাদ যে উচ্চারণ করলেন—

‘মা আমায় ঘুরাবে কত,

কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মতো ?’

—এ কেবল একটি সাধারণ জিজ্ঞাসা নয়। এর মধ্যে রয়েছে মধ্যযুগীয় স্বরে প্রতিবাদের ছবি। তা কর্কশ নয়, অনুযোগের সুরে মায়ের প্রতি সন্তানের প্রতিবাদ। মা সন্তানকে খেলার সুযোগ দিয়েছে, আবার খেলার অধিকারই তাকে দেয়নি। পদে পদে রয়েছে বাদ্ধবাধকতা। খেলা খেলছে দেবী মা নিজেই। কবির ভাষায় — ‘ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত’। সৃষ্টিকর্তার এই চাতুরী ধরা পড়েছে তার স্রষ্টার কাছে। তাই কবি জানতে চান— ‘তুমি কী দোষে করিলে আমায়, ছ-টা কলুর অনুগত।।’ মানুষ জানতে চায় কিসের দোষে সে ষঢ়রিপুর অনুগত। কেন সে জরা-মৃত্যুর কাছে ব্যাধিগ্রস্ত। কেন মানুষকে পুতুলনাচের পুতুল বানিয়ে রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে একটাই উত্তর — ভগবানের লীলা, তা মানুষের অগোচর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ বড়ো অসহায়। তাই কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো মানুষকেও প্রবৃত্তির ঘেরাটোপে আবদ্ধ সংসারের চক্রে পাক দিতে হচ্ছে। কিন্তু বলদের দ্বারা সম্ভব হলেও, মানুষের দ্বারা তা সম্ভব নয়। প্রবৃত্তিময় মানুষও তার মর্যাদা রক্ষায় আত্ম বিসর্জন দিতে পারে। বাংলা সাহিত্য তার অসংখ্য দৃস্টান্ত বহন করে। পদ্মাবতী হোক কিংবা জনা তারা তাদের মতো করে প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়ে তুলেছে। শাক্ত কবি রামপ্রসাদের ‘মা আমায় ঘুরাবি কত’ ধ্বনির মধ্যে ভগবৎ খেলার সমাপ্তি চাওয়া হয়েছে। অবশ্য তা আন্তরিকতায় জারিত। সেইসঙ্গে এ প্রতিবাদ সৃষ্টিকর্তার প্রতি হলেও এর বীজ রোপন করেছে সমকালীন অত্যাচারী জমিদার শ্রেনীর কাছে পদানত না হতে চাওয়া ব্যক্তিমন। মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে ভক্ত কবি এভাবেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের স্বর ফুটিয়ে তুলেছেন। যা আধুনিকতার সেতু বন্ধন রচনা করেছে।

বাস্তবিক মানুষের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মানুষের কেন ? সব কিছুরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই পদটির দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায়— কবিকে মায়ের চরনে স্মরণ নিতে। এখানে মা উদ্ধারকারিনী, এখানে মা আশ্রয়দায়িনী। মা শব্দ ‘মমতাযুত’। তাই একদিকে স্বার্থান্বেষী দেশীয় জমিদার অন্যদিকে বিদেশী শোষক

শ্রেণীর সাঁড়াষী-চাপে সাধারণ মানুষ যখন জীবনের পথ হাঁটছে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে শুনতে, তখন 'দুর্গা দুর্গা ব'লে তরে গেল পাপী কত' ভাবনাই ছিল একমাত্র পথের সঞ্চয়। তখন আশাবাদী কবি 'চোখের ঠুলি' খুলে মায়ের 'শ্রীপদ' দেখতে চেয়েছেন মনের মতো। স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে— যে মা তথা দেবতার খেলায় কবি অতিষ্ট হয়ে ইহ জগৎ থেকে উদ্ধার চেয়েছেন, যেখানে মানুষ কলুর বলদের মতো চোখে কাপড় বেঁধে চলতে বাধ্য হয়, সেখানে কি নিজের মতো করে মায়ের 'শ্রীপদ' দেখার ক্ষমতা রয়েছে তুচ্ছ মানবের? এখানেই সাহিত্যের জয় ঘোষনা করা হয়েছে। দেবী মাকে নিয়ে আসা হয়েছে ধুলিমলীন পৃথিবীর সরণিতে। 'শ্রীপদ' দেখার আশায় আশাবাদী মানব মনের স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। নিজে কুপুত্র হলেও 'কুমাতা নয় কখনতো' বলার মধ্যেও আশাবাদের প্রকাশ। আর সেই 'শ্রীপদে'র 'অন্তে থাকি পদানত' বলার মধ্যেও মানুষের বসবাস যোগ্য মর্তভূমিরই কামনা করা হয়েছে। আর এভাবেই আপাতভাবে পদটি 'দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে' ইহজগৎ থেকে 'তরে' যাওয়ার ভাবনা ব্যক্ত করলেও তা আসলে অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের কালপর্বকে অতিক্রম করার দীপ্ত আহ্বানে মুখরিত।

.....